ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয়

বন মহারাজের জীবন চরিতামৃত

সংকলক

শ্রীশ্রীমদ্ রসানন্দ বন মহারাজ



গৌড়ীয় গগনে উজ্জ্বল তারকা
শ্রীমৎ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ

শ্রীশ্রীগৌরবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ

বিশ্ববিশ্রুত বাগ্মীপ্রবর আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলা প্রবিষ্ট

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের

শতবর্ষ-আরম্ভ উপলক্ষ্যে তদীয়

জীবন চরিতামৃত।

আবির্ভাব—২৩/৩/১৯০১ তিরোভাব—৭/৭/১৯৮২

স্বামীজির কনিষ্ঠ সন্ন্যাসী অনুকম্পা দাস

শ্রীমদ্ রসানন্দ বন

শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর আশ্রম (কুসুম-কানন)

গ্রাম + পোঃ-শ্রীমায়াপুর, জেলা-নদীয়া।

শ্রীশ্রীগৌর গদাধর আশ্রম (কুসুম-কানন)
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া (পঃ বঃ) হইতে
ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ রসানন্দ বন মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও মুদ্রিত।

মুদ্রণেঃ—পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
চরস্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
ফোনঃ ৪৮-৩১৯ (০৩৪৭২)

শ্রীশ্রীগুরু গৌর গদাধর রাধা গোবিন্দ জয়তঃ

গৌড়ীয় গগনে উজ্জ্বল তারকা

শ্রীমৎ ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ

মধুমাস-এর আকাশে মধু, বাতাসে মধু, ধরায় মধু, ধরার ধূলিতে মধু। এমাস চির মধুরের, মধুর লীলার মধুর বিলাস সময়। এ মাস তার আনন্দ নিঃসন্দী বাতাবরণে সকলকেই আহ্বান করে। বসন্ত মিলনের আবাহন গীতির উদ্‌ঘোষক। এই মধুমাসে লীলাময় গোবিন্দের মধুর লীলার বিলাস, এই মধুমাসেই গোবিন্দের প্রিয়ভক্ত, তাঁর যুগান্তের চিহ্নিত সেবক, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর একনিষ্ঠ প্রবক্তা ত্রিদণ্ডী স্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ** এই মর্ত্ত্য ভূমিতে এলেন। সে আজ হইতে বিগত শত বর্ষ পূর্ব্বে ১৯০১ খৃঃ ২৩শে মার্চ বাংলা ১৩০৭ সালের ১১ই চৈত্র শুক্ল পঞ্চমী রবিবার বেলা ১২টায় বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রাজাবাড়ী থানার অধীন বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বহর গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পারিবারিক নাম—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতা ব্রহ্মর্ষি রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম শ্রীমতীদক্ষিণাকালী দেবী। মাতৃদেবীর সঙ্গে বালক নরেন শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী ও অন্যান্ন উপবাস করতেন।

ছোটবেলা থেকেই নরেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তনে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন। জাগতিক প্রলোভনের বশ্য নিচয়ের প্রতি বালক নরেন স্পৃহাশূন্য। তাঁর আত্মীয়গণ কৌতূহল বশত: জিজ্ঞাসা করতেন—'নরেন বড় হয়ে কি হবি?' উচ্চ কণ্ঠে

বলতেন—'আমি সাধু হ'ব।" তুই তিন বৎসর হতেই নরেন তুলসীর মঞ্চ তৈরী করতেন। তুলসী রোপন করতঃ প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ দিতেন এবং তুলসী তলায় বসে হাততালি দিয়ে হরিনাম করতেন। নিজের রোপিত তুলসী পত্র চয়ন করিয়া শ্রীশালগ্রাম পূজার জন্য পিতার হাতে দিতেন এবং মাঝে মাঝে তুলসী তলায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকতেন। ছোটবেলা থেকেই নরেন শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল যেন "আমি খুঁজে ফিরি তাঁরে"—এ বাণীর মূর্ত্ত অভিপ্রকাশ, জীবন সায়াহ্নে সিদ্ধির সুস্মিত প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে বলে গেছেন-- "এ জীবনে সাধনা করলে কৃষ্ণলাভ হয়।"

ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে ব্রহ্মর্ষি নরেন্দ্রনাথকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করলেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য তেলিবাগ গ্রামে 'কালীমোহন দুর্গামোহন' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়ে দেন। এই সময় গ্রামে একজন ভাগবত পাঠক আসেন। পাঠক ছিলেন গোলগাল চেহারা, সুবক্তা, রসিক সুকণ্ঠ এবং গায়ক। ভাগবত শুনবার জন্য নরেন্দ্রনাথ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পিতার অনুমতি নিয়ে পাঠ আরম্ভের পূর্ব্বেই সামনের আসন অধিকার করতেন। পুষ্পমাল্যে পাঠক-ঠাকুরের গলদেশ অলংকারে বাহু, মুকুট, মস্তক অলংকৃত করতেন। পাঠক-ঠাকুর পাঠ করতে করতে মাঝে মাঝে সুকণ্ঠে গান গেয়ে উঠতেন। অঙ্গভঙ্গি সহকারে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা যথাযথ আখ্যান করে শ্রোতৃবৃন্দকে হাসাতেন ও কাঁদাতেন এবং সখীগণের কৌতুকময় লীলা ভঙ্গী সহকারে বলতেন। পাঠক ঠাকুরের বলবার

ভঙ্গিমা খুবই মনোমুগ্ধকর হত। নরেন দুর্গোৎসবের সময় উক্ত পাঠক ঠাকুরের ভঙ্গিমায় ঘুঙুর বেঁধে ধুনোচি হাতে নৃত্য সহকারে জগজ্জননীর আরতি করতেন। নরেন্দ্রনাথের ধুনোচি নৃত্য দেখবার জন্য পাড়ার বহুলোক উপস্থিত হতেন। নয়-দশ বৎসর বয়সের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ বিচিত্র শিল্প কর্ম্মে রুচি ও নৈপুণ্যের সাক্ষর রেখেছিলেন।

১৯১৩ খৃঃ নরেন্দ্রনাথ তেলিবাগ হাইস্কুলে উত্তীর্ণ হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকামাক্ষ্যাচরণ রাঁচিতে নিয়ে যান। সেণ্টপল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করে দিলেন। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য বাইবেল ক্লাসে নানা প্রশ্ন করে এবং খৃষ্টান ধর্মে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে দ্বিধা বা ভয় করতেন না।

এইভাবে রাঁচির ইংলিশ মিশন স্কুলে এক বৎসরের মধ্যে নরেন্দ্র হিন্দি বলতে শুরু করলেন।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের উপনয়ন সংস্কার হয়। পিতা পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক অন্নগ্রহণ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। "ভুবঃ পতয়ে নমঃ,' 'ভুবঃ পতয়ে নমঃ' 'স্বঃ পতয়ে নমঃ', 'ভূতানাং পতয়ে নমঃ' 'ভূর্জাম্ পতয়ে নমঃ"—বলে ভূমিতে পঞ্চভাগে অন্নপ্রদান পূর্ব্বক—"প্রাণায় স্বাহা ১', আপনায় স্বাহা ২) ব্যানায় স্বাহা ৩) সমানায় স্বাহা ৪) উদানায় স্বাহা ৫) এই মন্ত্র সহকারে পঞ্চগ্রাস গ্রহণ করে তুষ্ণীম্ভূত অবস্থায় আহার্য্য গ্রহণে নিযুক্ত হতে হবে এবং "অমৃতোহপি ধ্যান মহি স্বাহা"—বলে এক গণ্ডূষ জল পান করে আহার গ্রহণ শুরু করতে হবে এবং ভোজনান্তে

"অমৃতোঽপি স্তরণমসি স্বাহা" বলে পাত্রত্যাগ করতে হবে।

প্রসাদ গ্রহনের সময় কোন কথা বলা ও শব্দ উচ্চারণ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এইভাবে সাতদিন কাটিয়ে পুষ্করিণীর জলে অবগাহন স্নান পূর্ব্বক দণ্ড জলের মধ্যে পুঁতে রেখে উপরে উঠেন এবং ধুতি চাদর পরিধান করে বাড়ী ফেরেন। নরেন্দ্রনাথের উপনয়ন সামবেদীয় বিধানেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। এরপর যখন নরেন্দ্রনাথ স্কুলে গেলেন, শিখাযুক্ত মুণ্ডিত মস্তক দেখে শিক্ষক মণ্ডলী খুশী হলেন বন্ধুগণ শিখা ধরে দু'একবার টানল। তার উত্তরে নরেন বললেন আমার মত মস্তকে শিখার অধিকার ভাগ্যের ব্যাপার।

নরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনাদি করতেন। একদিন সমবয়স্কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অমলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয় ভাল হওয়ায় বন্ধুগন গোপন ভাবে ভাঙ্গের সরবত পান করিয়েছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে আর কোনওদিন কোন নেশা করেন নি। পরে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্ররূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন।

নরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে কৃষ্ণান্বেষণ করতে বেড়িয়ে পড়তেন এবং গান করতেন—

হরি! তোমায় ভালবাসি কৈ ?
আমার লোক দেখান ভালবাসা
মুখে হরি হরি কই।

যে তোমারে ভালবাসে বাঁধা থাক তার'ই পাশে
আমি যদি বাসতাম ভাল
জানতাম না আর তোমা বই।

দুই চোখ ভরা অশ্রুর বন্যা। আকাশবাণীতে বামাকণ্ঠে কেহ বলছেন বৎস! কঠিন পথ ধরেছ, সাবধানে চলো। বিভিন্ন স্থানে গুরুর সন্ধান করতে যেতেন, কিন্তু তার চির আরাধ্য শ্রীগুরু-দেবের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসতেন মনদুঃখে। সংসার তিনি বিষতুল্য অনুভব করতে থাকেন। তিনি চিন্তা করতেন একমাত্র ভগবদ্দর্শন বিনা এই মনুষ্য জীবনের কোন মূল্য নেই। কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের খোকা মহারাজের নিকট কখনও লোহারপুরের নবীন সন্ন্যাসীর নিকট আবার কখনও অতুল কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট কোন দিন কোন তিলকধারী বৈষ্ণবের নিকট গিয়া শ্রীভগবৎ অনুসন্ধান করতে থাকেন এই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করেন কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পেলেন না। এক সময় নরেন্দ্র-নাথ তাঁর পিতাকে ঢাকার মেডিকেল হস্‌পিটালে ভর্ত্তি করে বাড়ী ফিরছেন, এমন সময় সরুবালা গুপ্তা নামক এক বিদুষী প্রৌঢ়া নরেন্দ্রনাথকে ডেকে বললেন—শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে গেলে তোমার গুরু মিলবে।

এই কথা শুনে পরের দিন দ্বিপ্রহরের সময় তিনি ঢাকাস্থ গৌড়ীয় মঠে গিয়ে দ্বিতলে একটি ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের একটি চিত্রপট দর্শন করিয়া তাঁহাকে তাঁর নিত্য আরাধ্য শ্রীগুরুদেব বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে দৈন্য সহকারে অনেক আর্ত্তি প্রকাশ করেন। তারপর মঠবাসী সেবকের নিকট হতে

শ্রীগুরুদেবের নাম ও কলিকাতার ঠিকানাটি লিখে লইলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পিতা সহ অন্য সকলের ভার অর্পণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে ১লা আষাঢ় ১৯২৪ খ্রীঃ কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি রোডস্থ গৌড়ীয় মঠে পৌছিলেন। তাহার পর তাহার জীবনের উদ্দেশ্য, সকল কথা শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করতঃ প্রভুপাদ অনেক হরিকথা বলার পর বলিলেন আমার কথা শুনে তুমি কি বুঝেছ একটি প্রবন্ধ লিখে আমাকে দিবে। তখন নরেন্দ্রনাথ "আত্মীয় কে ?"—এই প্রবন্ধ প্রভূপাদকে দেন। প্রভুপাদ প্রবন্ধটি পড়ে খুবই খুশী হলেন। তারপর প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় পূর্ব্বক মস্তক মুণ্ডন করিয়া গলায় ত্রিকণ্ঠী মালা এবং দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিয়া বৈষ্ণব বেশ গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ নাম পরিবর্ত্তন করে নাম রাখেন "নন্দসুনু ব্রহ্মচারী"। তার পর সুযোগ্য শিষ্য জেনে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস প্রদান করতঃ সকল জীবের হৃদয়ে ভক্তিরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত করিবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাস-প্রদত্ত নাম হইল, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ। ১৯২৫ হইতে ১৯৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমন করিয়া বিভিন্ন নগরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমপ্লাবন বহাইয়া দেন। এই সময় স্বীয় গুরুদেবের নির্দ্দেশানুসারে তিনি মাদ্রাজে একটি বিরাট মন্দির ও একটি নাট্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং গুণ্টুর গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও ঢাকায় দুইটি প্রদর্শনী সংগঠন

করেন এবং প্রভুপাদের নির্দ্দেশে দুই হাজার যাত্রী লইয়া শ্রীব্রজধাম পরিক্রমার ভার প্রাপ্ত হন।

শ্রীচৈতন্য মঠের যে প্রদর্শনী হয়. রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি-গোবর্দ্ধন, বিভিন্ন কুণ্ড. সেই প্রদর্শনীর ভার প্রভুপাদ বন মহারাজকে দেন। স্বামীজী ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যেই প্রচার করতেন। বিভিন্ন শহরে এবং শিক্ষিত মহলে তার ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার হত।

১৯৩৩ খৃঃ প্রথম তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। বন মহারাজের বয়স তখন ৩৩ বৎসর। মহাপ্রভুর ভবিষ্যত বাণী—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদিগ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

এই কথা সার্থক করার জন্য প্রভুপাদের যোগ্যতম শিষ্য স্বামী বন মহারাজ প্রথম যান ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মান, চেকোশ্লোভিয়া, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্সে। তারপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা হল। সামান্য দিনের মধ্যেই ডলারের প্রাচুর্য্য দেখা দিল। সম্মানজনক উপাধিরও সেই সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। পিপ্‌লস্ ইউনিভার্সিটি অব্ আমেরিকা তাঁহাকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ্ ডি, ডি, ডি, ডি, ডি, থিয়স্, আই, পি, এইচ-ডিঃ পুনরায় ডি, ডি, প্রভৃতি উাপাধির বন্যা এসে গেল। এখানে লক্ষ্যণীয় পৃথিবীতে ডি, ডি, উপাধীতে ভূষিত ভাগ্যবানের সংখ্যা খুব বেশী

নয়। এঁদের মধ্যে বন মহারাজ পেলেন দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ডি. সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি একক।

১৯৩৩ খৃঃ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩৬ খৃঃ পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া পৌছান অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এক্সিটার ও ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্লিন, লাইপজিগ, ড্রেসডেন, মিউনিক, কোনিসবুর্গ, টিউবেনগেন, মারবুর্গ, বন, প্যারিস ও প্রাগ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, ভিয়েনায়, কুলটুববুঁদে. প্রাগের ওরানিয়ায়, লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে, বার্লিনের লেসিং হকসলে বয়রণে ক্যাথলিক মনাষ্টারীতে এবং ওয়াল্টেজের কন্‌ভেন্ট ও আরও বহু জায়গায় তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছিল ঐ সময় তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই প্রথম ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী যাঁহাকে সম্রাট এইভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। জাপান সরকার বন মহারাজকে লইয়া গেলেন, টোকিও শহরে রাজ অতিথিরূপে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য। রাজোচিত আড়ম্বরে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন জেনারেল তেজো। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ভাষণের আয়োজন চলতে থাকলো। সে জন্য তাঁহার জগৎজোড়া খ্যাতি।

১৯৩৪ খৃঃ তিনি হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইংলণ্ডে সফর কালে একটি শ্রীচৈতন্য মিশন সোসাইটি সংগঠনের সূচনা করেন। এই ব্যাপারে তিনি ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রসচিব মার্কুইস্ অব জেটল্যাণ্ডকে সভাপতি এবং লর্ড লেমিংটনাকে সহ-সভাপতিরূপে বরণ করেন। ঐ সময় তিনি একটি শ্রী শ্রীরাধাকৃষ্ণের

মন্দির প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে ইংলণ্ডে যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি বিশেষ উৎসাহ ও সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চ্চবিশপদ্বয়, লণ্ডনের লর্ড বিশপ, লর্ড জেটল্যাণ্ড, লর্ড হ্যালিফাক্স, লর্ড গোসেন, মিঃ আর, এ. বাটলার, লেডী কারমাইকেল, স্যার ফ্রান্সিস্‌, ইয়ংহাসব্যাণ্ড, স্যার ডেনিস নরস, স্যার এডলিন রাঙ্ক, মিঃ আমেরী প্রভৃতি। আর ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা তাঁহাকে উৎসাহিত ও সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাঃ এস্‌, রাধাকৃষ্ণন্‌, ডাঃ এস্‌ সচ্চিদানন্দ সিংহ. স্যার পি, এল, শিবস্বামী আয়ার, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী, ডাঃ এম, আর, জয়াকর, এইচ, ভি, দিবাইয়া, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, ডাঃ কে, এন, কাটজু, এবং আরও অনেকে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় তিনি এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৯৩৫ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সে এক গৌরবোজ্জ্বল অবিস্মরণীয় দিন। স্বামী বন মহারাজ ফিরিয়া আসিতেছেন ইংলণ্ড, জার্মানী, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স প্রমুখ পশ্চিম ইউরোপের ধর্ম জগতের এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে, বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে, তাঁহার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের চরণ প্রান্তে।

বোম্বে মেল হাওড়া পৌঁছাইবে সকাল ১০/৪০ মিনিটে। প্লাটফর্ম্মটি সুসজ্জিত। চন্দ্রাতপের নীচে বিশসহস্রাধিক গুণমুগ্ধ নরনারী সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন বন মহারাজকে অভ্যর্থনার জন্য মালা-চন্দন নিয়ে, সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ ক্যামেরা উঁচিয়ে

প্রস্তুত হয়ে আছেন। ট্রেন পৌঁছতেই জন সমুদ্র দুলে উঠলো। মহারাজ গুরুদেবাশ্রম প্রসাদশাহী প্রথমে মহারাজজীকে মাল্য-দান করতেই মাল্যদানের সাগ্রহ সমারোহ আরম্ভ হল। শোভা-যাত্রা চলেছে হ্যারিসন রোড, চিৎপুর রোড, মুক্তারাম ষ্ট্রীট, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ও বাগবাজার ষ্ট্রীট ধরে অগণিত নব নির্মিত তোরণ ও পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান জন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গৌড়ীয় মঠ লক্ষ্য করে। সেখানে স্বামীজীর শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ অপেক্ষা করছেন আশীর্বাদের অভয় হস্ত প্রসারিত করে। স্বামীজী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ প্রান্তে ভূনত দণ্ডবৎ প্রণত হলেন। বিকাল ৫ ঘটিকায় গৌড়ীয় মঠের সারস্বত শ্রবণ সদনে সম্বর্দ্ধনা সভা বসলো। সভাপতির আসনে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয় চাঁদ মহতাব বাহাদুর। সভার গৌরব বৃদ্ধি করলেন জার্মানীর কনসাল জেনারেল।

সভার আহ্বায়কগণের মধ্যে আছেন :- মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর, মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী, মহারাজা গুরুদেবাশ্রম প্রসাদ শাহী, রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিন্‌হা, সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, রাজা পি. এন. ঠাকুর, প্রিন্স আক্রাম হোসেন, মেয়র এ. কে. ফজলুল হক্, হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী, বিচার পতি দ্বারকা নাথ মিত্র, বিচারপতি রূপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার বি. এন. মিত্র, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহরায়, স্যার হাসান সোহরাবর্দী, স্যার

বদ্রীদাস গোয়েঙ্কা. স্যার নীলরতন সরকার, ভাইস্ চ্যান্সেলর শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জী, মিসেস, নেলী সেনগুপ্তা, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর মন্টুলাল তাপুরিয়া, রায় বাহাদুর রায় দেও চোখানী, রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, রায় বাহাদুর আশুতোষ ঘোষ. ভাগ্য-কুলের বি, কে, রায়, রায় বাহাদুর রামতারন ব্যানার্জী, চিফ্ একজিকিউটিভ অফিসার জে, সি, মুখার্জী, সাংবাদিক তুষার কান্তি ঘোষ, দেবীপ্রসাদ খৈতান, জে, সি, গুপ্ত. ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জী. আনন্দমোহন পোদ্দার প্রমুখ মহানগরীর আরও বিশিষ্ট ত্রিশজন উপস্থিত ছিলেন।

এই অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনার কারণ হল স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের ইউরোপ বিজয়।

১৯৩৬ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবের পর তিনি গৌড়ীয় মঠের আভ্যন্তরীন কলহ হইতে দূরে সরিয়া যান এবং শীঘ্রই ব্রহ্মদেশে চলিয়া যান। সেখানে টাউন হলে তাঁহাকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। রেঙ্গুন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি অযোধ্যায় বেদপাঠ শুরু করেন এবং 'বেদের পরিচয়' বাংলায়, দি গীতা এ্যাজ এ চৈতন্যাইট রীড্স্ ইট ও শ্রীচৈতন্য ইংরাজীতে গ্রন্থগুলি রচনা ও প্রকাশ করেন।

১৯৩৯ খৃঃ ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। এই সময়ে জাপান সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সাংস্কৃতিক বিভাগ কর্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, কলম্বিয়া ও

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। নিউইয়র্কের সোসাইটি অব্ এ্যাপ্লায়েড সাইকোলজিতে অনুষ্ঠিত আমেরিকার ব্রহ্মবাদ দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে এবং বোষ্টনে, ষ্টকব্রীজ. ফিলাডেলফিয়া এবং ওয়াশিংটন ডি, সি, এবং বিভিন্ন সমিতিতেও তিনি বক্তৃতা করেন। জাপানে টোকিওর ওক্মা হলে ইন্দোজাপানীজ এসোসিয়েশনে, কুকোশাই বুক্কাশিকোকাইএ পীয়ার্স ক্লাবে, প্যানপ্যাসিফিক ক্লাবে, টোকিওর কলম্বিয়া ইউনিভারসিটি ক্লাবে। কুইওটো বিশ্ববিদ্যালয়ে টোকিওর বুদ্ধসঙ্গে, টোকিও ও কোবের ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানে এবং টোকিওর ওয়াই. এম. সি, এ, তে স্বামীজী বক্তৃতা করেন। হংকং উপনিবেশে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনাদের এক বিশেষ জনসমাবেশে স্বামীজী ভাষণ দান করেন। জাপানের ভূতপূর্ব নেতা তেজো, কবি নাগুচি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। ১৯৪১ খৃঃ তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন।

১৯৪২ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ও গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী তীর্থ পর্য্যটন করেন। কঠোর ব্রতের মধ্যে ১) মৌন ব্রত, ২) নিরন্তর মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন, ৩) ফলাহার অথবা দুগ্ধপান ৪) ভূমিতে শয়ন প্রভৃতি ব্রত উদ্‌যাপনে মহারাজের দৈহিক ওজন ৩৮ পাউণ্ড হ্রাস পাইল।

অতঃপর শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া সুকঠোর কৃচ্ছসাধনের মানসে ভূগর্ভস্থ এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। এখানে চারটি ব্রত পালন করেন। ১) রাত্র ৪ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত মালিকাতে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন, ২) কোন মানুষের মুখ-

দর্শন না করা, ৩) ভূমিশয্যায় শয়ন, ৪) রাত্র ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা পর্যন্ত উপবাসী থাকিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দকে অন্ন আলুসিদ্ধ, ঘৃত ও কটি কদলী ভোগ নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। এই সংকল্প সাধনে দৃঢ়ব্রত হয়ে সুদীর্ঘ ৪ বৎসর কাল পরে স্বরূপ সিদ্ধ হইয়া ব্রত সমাপ্ত করিলেন।

১৯৪৯ খৃঃ তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসীর সেবার উদ্দেশ্যে "বৈষ্ণব থিওলজিক্যাল ইউনিভারসিটি প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর পরবর্ত্তীতে ১৯৫০ খৃঃ শ্রীল ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সাড়ম্বরে সজ্জিত হস্তীপৃষ্টে শোভাযাত্রার পুরোভাগে প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমের পথে। মস্তকোপরি স্বুবর্ণ খচিত রৌপ্য ছত্র। ডাইনে, বামে ও পেছনে গৈরিক পতাকাবাহী সন্ন্যাসীর দল। লক্ষ লক্ষ কুম্ভস্নান প্রয়াসী পূণ্যার্থীর শ্রেণীবদ্ধ শোভাযাত্রী, সংঙ্গীতে, বাদ্য-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। এই সমারোহের মধ্যে মহা-রাজ চলেছেন কুম্ভমেলায় সাধু সমাবেশে ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ের ভাষণ প্রদানের জন্য। সেখানে তিনি জনমুগ্ধকরভাষণও প্রদান করেন।

১৯৫২, ১৯৫৪, এবং ১৯৫৬ খৃঃ শ্রীল মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত উৎসবে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে ডাঃ এস, রাধাকৃষ্ণন (ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি), ডাঃ কে, এন কাটজু (ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) এবং শ্রী সি, পি, এন, সিং (পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল)। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশক্রমে ১৯৫৮ খৃঃ বৈষ্ণব থিওলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির

নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'ইনস্টিটিউট অব্ ওরিয়েণ্টাল ফিলসফি' করা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি স্বামী বন মহারাজ ইনস্টিটিউটের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফি এ্যাণ্ড কালচার'-এর সম্পাদক হন।

১৯৬০ খৃঃ ১০ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত পশ্চিম জার্মানীর মারবুর্গে দশম আন্তর্জাতিক ধর্ম্মোতিহাস সমিতির সম্মেলনে তিন প্রতিনিধিকে লইয়া তিনি মারবুর্গ যাত্রা করেন। উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল "বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরলোকতত্ত্ব" (অরিজিন এ্যাণ্ড এস্ক্যাটোলজি অব্ রিলিজিয়নস্) স্বামীজী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নব আন্তর্জাতিক কার্য্যকর সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। সম্মেলনের প্রারম্ভে তিনি ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বাণী পাঠ করেন। তাঁহার পর তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরলোক তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পাঠ করেন। মারবুর্গের সম্মেলন শেষ হইলে ভিয়েনা, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, ডেনমার্ক প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়া ভারতে ফিরিবার সময় তিনি প্যারিসে "ইউনেস্কো" (সংযুক্ত জাতীয় শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ) এর প্রধান কার্য্যালয় পরিদর্শন, প্রধান প্রধান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও ধর্ম-তত্ত্ব আলোচনা করেন। লণ্ডন হইতে সমুদ্র পথে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথে প্রথমে বোম্বাই-এ এবং পরে মথুরা ও কলিকাতায় তাঁহাকে বিশেষ নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত সভায় কলিকাতার পৌরজন, স্বামীজীকে অভিনন্দিত করেন।

১৯৬২ খৃঃ ৬ই, ৭ই ও ৮ই জানুয়ারী শ্রীমৎ স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনে ইনষ্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল ফিলসফিতে (প্রাচ্যদর্শন মহাবিদ্যালয়ে) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সর্ব্বভারতীয় আলোচনা-চক্র আহ্বান করেন। ভারতের ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দেড়-শত প্রতিনিধি এই আলোচনা চক্রে যোগদান করেন। ইহার উদ্বোধন করেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচার-পতি মাননীয় শ্রী বি, বি, সিং।

১৯৬৪ খৃঃ ৪ঠা হইতে ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত নিউদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক প্রাচ্য সম্মেলনে তিনি বেদপাঠের অদ্বিতীয়তা, "দি ইউনিকনেস্ অব্ বৈদিক রিডিং" সম্পর্কে তাঁহার রচনা পাঠ করেন।

নন্দগ্রামে আর একটি ইন্টার মিডিয়েট কলেজ স্থাপনা করিয়া ব্রজবাসী বালকগণের পড়াশুনার সুযোগ প্রদান করেন। স্বামীজী মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ ভজন কুটির ও নন্দগ্রামে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর ও পাবন সরোবর, উঃ ২৪ পরগণায় হিঙ্গল-গঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রম এবং কলিকাতাস্থ ভজন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর গদাধর আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীল মহারাজ ২৪/৩/১৯৭৮-এ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের আচার্য্যপদ অলংকৃত করেন।

সুদীর্ঘ ৮০/৮১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের বহু অভীষ্ট

কার্য্য সাধন করিয়া স্বামীজী ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে অসুস্থলীলা প্রকাশ করেন, তিনি অতঃপর জানাইলেন যে তিনি আর ঔষধাদি গ্রহণ করিতে রাজী নন। তিনি বলিলেন বহুদিন ঔষধ গ্রহন করিয়াছি, আর নয়। ঔষধ ত্যাগ করিবার পর আহারও ক্রমশঃ ত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আমি সঙ্কল্প গ্রহণ করিলাম ১৫ দিন আহার করিব না। সেইদিন হইতে অল্প অল্প ফলের রস ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণামৃত গ্রহণ করিতেন ১৫দিন পর্য্যন্ত। ইহার পর ফলের রসও ত্যাগ করিলেন। দুইবার কেবল মাত্র চরণামৃত গ্রহণ করিতেন। এই সময় তিনি সুস্থের ন্যায় নিত্য কৃত্য স্নান কার্য্যাদি করিতেন। তাঁহার শরীরে জ্বর না থাকিলেও ভীষণ তাপ ছিল। সর্ব্বদা প্রচণ্ড দাহ অনুভব করিতেন। যার জন্য সর্ব্বদা তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রত্যহ ১০ কিলো বরফ মার্জন করিতে হইত। এই তাপটি কিজন্য? গোস্বামীগণ বলিয়াছেন যে শ্রীশ্রীরাধা, শ্রীশ্রীগোবিন্দের বিরহজনিত তাপে যখন বিভাবিত হইতেন, তখন তাঁহাদেরও ঐ বিরহরূপ অগ্নিতাপ প্রকাশ পাইত। মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের সেইভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। আমরা তাঁহার অর্থ বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছি। এইভাবে ৯০ দিনের মধ্যে ৬৮ দিন সম্পূর্ণ অনশনে থাকিয়া ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই জুলাই বুধবার রাত্রি ৯টা ৪ মিনিটে তিনি শ্রী শ্রীরাধাগোবিন্দের অভিসার গমনকালে তাঁহাদের সঙ্গে অভিসারলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

লীলায় প্রবেশের ১০দিবস পূর্ব্বে অনুগত ভক্তগণকে জানাইয়াছিলেন তিনি উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে চলে যাবেন এবং সকল শ্রদ্ধালু

ভক্তগণকে ডেকে বলেন,—তোমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও প্রভুপাদের আচার আচরণ অনুসরণ করিবে এবং প্রত্যেকে নিষ্ঠাসহকারে ভজন করিবে।

পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের উপদেশাবলী

নামের স্বরূপ

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধ নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্বান্নামানামিনোঃ॥

—অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ। নামই-স্বয়ং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। চৈতন্যরূপী নামই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কৃষ্ণনাম পূর্ণ অখণ্ড অদ্বয়বস্তু। শ্রীকৃষ্ণনাম মায়াতীত-মায়াধীশ-মায়া তাঁহার অধীনা শক্তি। শ্রীনাম নিত্যমুক্ত স্বতন্ত্র স্বরাট্। কেননা, শ্রীকৃষ্ণনাম ও শ্রীকৃষ্ণে—নাম ও নামীতে, কোনই ভেদ নাই।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

এই শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভু অখিলশ্রুতির সার ও মুক্তকুলের চিরারাধ্য বস্তু।

"নিখিল শ্রুতি মৌলি রত্নমালা
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

—শ্রীল রূপ গোস্বামী

নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্ রূপ রত্নমালার প্রভা-নিকর দ্বারা তোমার পদ কমলের শেষ সীমা নিরন্তর নীরাজিত হইতেছে। হে হরিনাম। তুমি মুক্তকুলের (নিবৃত্ততর্ষ নারদ-শুকাদি) দ্বারা নিরন্তর উপাসিত হইতেছ। অতএব হে হরিনাম! আমি সর্ব্বতোভাবে-সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি।

জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য-যৌবন এই চতুর্ব্বিধ বিষয়ে গর্ব্বিত ব্যক্তি শ্রীনাম-কীর্ত্তনে অধিকারী নহেন ; কারণ শ্রীহরি অকিঞ্চন জনের নিকটই গোচরীভূত হন। কলিযুগ-পাবন-অবতারী সংকীর্ত্তন-পিতা নাম-প্রেম-প্রদানকারী ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি বিশ্বে নাম বিতরণ করিয়া নিজ-আচরণ দ্বারা শ্রীনাম কীর্ত্তনের প্রণালী জানাইয়াছেন।

নাম-সাধন-প্রণালী

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

যিনি তৃনাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনি সদা হরিকীর্ত্তনে অধিকারী, আদরের সহিত নামকীর্ত্তন করিতে করিতে বিষয় পিত্তোপ্ত রসনায় ক্রমশঃ ঐ নাম সিতপলসম মধুর বলিয়া আস্বাদিত হইতে থাকেন।

শ্রীনাম-ভজনে নামাভাস ও নামাপরাধের সহিত শুদ্ধনাম কীর্ত্তনের তারতম্য ভেদ ও ফলপ্রাপ্তির পার্থক্য সাধক মাত্রই সুষ্ঠুভাবে জানিয়া লইবেন। সাঙ্কেত্য-পরিহাস্য-স্তোভ-হেলনাদিরূপ চতুর্ব্বিধ

“নামাভাস’ হইতে পাপ-বিমুক্তি হয় ; কিন্তু কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় না। অসৎসঙ্গে দশবিধ ‘নাম-অপরাধ’ থাকাকাল পর্যান্ত কোটি জীবন ধরিয়াও তৎপ্রকার নামাপরাধযুক্ত নাম-কীর্ত্তনে কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ হয় না। একবার-‘নামাভাসে’ অনন্ত পাপ বিনষ্ট হয় ; এবং একবার শুদ্ধনাম উচ্চারণ মাত্র হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় করাইয়া শ্রী কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-ধাম-পরিকর-লীলাদির সম্যক্ স্ফুরণ করাইয়া থাকে। নামভজন-কারীর পক্ষে এই সকল উত্তমভাবে অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক-নতুবা আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রাপ্তি হইবে না।

১। তোমরা সম্বন্ধযুক্ত হরিনাম করিবে।

২। তোমরা তুলসীসেবা নিত্য করিবে।

৩। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভগবৎ বিগ্রহ সেবা করিবে।

৪। তোমাদের পাণ্ডিত্য নাই। অল্প লেখাপড়া করেছ। তোমরা ভাগবৎ শ্রবণ করিবে এবং পাঠ করিবে। শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধে এবং চৈতন্য ভাগবত. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, জৈবধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত, ষড়গোস্বামী কৃত গ্রন্থ সমূহ শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কীর্ত্তন করিবে।

৫। ভগবদ্ধামে সর্ব্বদা বাস করিবে। সাক্ষাতে বা মানসে ধাম-বাস ব্যতীত ভজন হয় না।

৬। বৈষ্ণব সেবা করিবে। অর্থাৎ নিজ পরিচিত, সদাচার সম্পন্ন, হরিনাম-আশ্রিত, অভিমান শূন্য ভগবচ্চরণে শরণাগত বৈষ্ণবের সঙ্গে আদান-প্রদান করিবে।

৭। ভোগবাদ অর্থাৎ সুখবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ ভজন

করিতে হইবে। মোহে মোহিত থাকাকালীন হরিভজন হয় না।

৮। সাধু সঙ্গের প্রয়োজন কারণ সাধুর মুখ-নিঃসৃত কথার বীর্য্য আছে। সে কথা শুনিলে আমাদের কার্য হইবে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে সাধু কে?

শ্রুতি বলেন—

"যিনি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠিত, তিনি সৎ। কৃষ্ণদাস্যই জীবের সত্ত্বা বা স্বভাব। সেই কৃষ্ণদাস্যে যিনি নিযুক্ত, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সৎ বা সাধু।" কৃষ্ণ ভক্তই সাধু। ভক্তিই সাধুত্ব। শ্রীভগবানে ভক্তি যাহার নাই, তাহাকে সাধু বলা যায় না। এ জন্য অভক্তই অসাধু। শাস্ত্র বলেন—"কামিনী কাঞ্চন আসক্তি রহিত ব্যক্তিই সাধু। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী যাঁর ত্যাগ হইয়াছে, তিনিই সাধু।

৯। বৈকুণ্ঠের পথে সাধুগণ নিয়ে যেতে পারেন। অন্যে তাহা পারেন না। সাধু যিনি হবেন, তিনি বলবেন—যে তুমি মোহ ছাড়। সাধু মুখে হরিকথা শুনিলে আমাদের আত্ম কল্যাণ হইবেই এবং কৃষ্ণে আসক্তি হইবে। কৃষ্ণে আসক্তি হইলেই মোহমায়া দূরে পলায়ন করে।

১০। এজগৎ আমাদের বিদেশ। স্বদেশে আমাদের ফিরে যেতে হবে। তার জন্য আমাদের ভজন পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কৃষ্ণের প্রতি শরণাগত হইতে হইবে।

১১। কৃষ্ণ ভজন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সদাচার পালন করিতে হইবে। রজঃ-তমোগুণ দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে এবং সত্ত্বগুণ ভাবাপন্ন দ্রব্যের উপর ইষ্টমন্ত্র জপ করে ভগবানকে নিবেদন

করিবে। সেই দ্রব্যসকল ভগবদ্-প্রসাদ বুদ্ধিতে ভজনজীবন রক্ষার্থে সেবন করিবে।

১২। জীবন-ধারণ করার যতটুকু প্রয়োজন, সেই পরিমানে গ্রহণ করিয়া ভজন-জীবন ধারণ করিবে।

১৩। দ্যুতক্রীড়া—পাশা, দাবা, লটারী, তাস, প্রভৃতি অসৎ খেলা খেলিবে না।

১৪। পবিত্র চরিত্র গঠন করিবে। বিবাহিত ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষ কাম চরিতার্থ করিবে না।

১৫। পান, বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, মদ প্রভৃতি অসৎ নেশা করিবে না।

১৬। শুনা—অর্থাৎ হিংসা ত্যাগ করিবে।

১৭। কাঞ্চন—আত্মচরিতার্থ বিষয় পরিত্যাগ করিবে।

মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতঅস্তম্ মমত্ব যৎ সঃ মোহ ইতি কীৰ্ত্তিত ॥—

সারা জগতের মানুষ মোহগ্রস্থ। মোহগ্রস্থ মানুষ ভগবান থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। মিথ্যা অভিমানের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছে। যখন ভগবানের শক্তি সঞ্চারিত হইবে, তখন নিজের মহাভ্রান্তি জানিয়া "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কার্ত্যাহম্ ইতি মন্যতে"—এই ভ্রান্তি হইতে দূরে সরিয়া আসিবে।

—০—

শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রীগুরু আবির্ভাব তিথি শ্রীচৈত্র শুক্লা পঞ্চমী
এসেছে করুণা করিয়া।
বরষে বরষে আসি হৃদি সিংহাসনে বসি
সেবা দেন সদয় হইয়া॥

তব অহৈতুকী দয়া, লইয়া জুড়াই হিয়া,
এই মোর কাতর প্রার্থনা।
অত্যন্ত দুর্ব্বল আমি, মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমি,
না করিনু গুরু আরাধনা॥

আমি সদা অপরাধী না জানি ভজনবিধি
গুরুভক্তি নাহি মাত্র-লেশ।
আজি তব আবির্ভাব- তিথি হইয়াছে প্রকট
অবিদ্যা-তিমির করিবারে নাশ॥

তব স্মৃতি আলো জ্বালি অপরাধ নাশ করি
প্রকাশিছে প্রেমভক্তি রস।
রসানন্দ বন কয় শতবর্ষ আরম্ভ হয়
জয় জয় তব লীলা রস॥

—ঃঃ—

শ্রী শ্রী জগৎনাথ বলদেব
সুভদ্রা মন্দির